মন্তব্য প্রতিবেদন

স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্ক

সম্ভাব্য অরাজনৈতিক সমাধান

লিখেছেন **সৈয়দ আনোয়ার হোসেন**

২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। মাঝখানে ন'মাস চলেছিল মুক্তিযুদ্ধ। পেছন ফিরে তাকিয়ে এ দুটো দিন আর ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমরা যে নস্টালজিক ভাবনায় প্রাণিত হই তা কিছুটা যেন বিপন্ন হয় যখন একটি বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। অবশ্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত এমন ভাবনাকে যা বিপন্ন করে তা বিভাজিত রাজনৈতিক চেতনা উৎসারিত। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা রক্ষা করে স্বাধীনতা দিবস থেকে বিজয় দিবস পর্যন্ত ভাবনা এগিয়ে নিতে গেলে আমরা ২৬ মার্চেই হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ি। এ হোঁচট খাওয়া আর মুখ থুবড়ে পড়ার ব্যাপারটি চলছে বিগত দু'দশক ধরে; তবে দ্বিতীয় দশকেই তা বেশ গুরুতর আকার ধারণ করেছে। ফলে ২৬ মার্চ পেরিয়ে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের ভাবনা অগ্রসর হতে পারছে না। কাজেই ২৬ মার্চে আটকে পড়ে থাকলে তো আর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা সম্ভব নয় বা বিষয়টি নিয়ে সামগ্রিক ভাবনাও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

স্বাধীনতার ঘোষক সংক্রান্ত বিতর্ক নিয়ে আমাদের ২৬ মার্চে আটকে পড়া। কিন্তু লক্ষণীয় যে দু'জন বড় মাপের ব্যক্তিত্বকে ঘিরে এ বিতর্ক, তাঁদের জীবদ্দশায় বিতর্কটি ছিল না। বিতর্ক শুরু হয়েছে তাঁদের লোকান্তরণের পর উভয় ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক অনুসারীদের অযৌক্তিক অতি উৎসাহী ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উদ্যোগের কারণে। অথচ ব্যাপারটি রাজনীতির নয়, ইতিহাসের। কাজেই বিতর্ক সৃষ্টি হলেও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত সিদ্ধান্তের চেয়ে ইতিহাসের রায়ই মুখ্য হবার কথা ছিল; এবং তা হলে বিতর্কও অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত হতো। স্মর্তব্য, ইতিহাসের ওপর রাজনীতি চড়াও হলে ইতিহাস তার চারিত্র্য হারায়; অন্যদিকে ইতিহাস রাজনীতিকে পরিচালিত করলে রাজনীতি সেই শক্তি পায় যা দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া যায়। রাজনীতি আক্রান্ত ইতিহাস, আর এমন ইতিহাস প্রভাবিত রাজনীতি জাতির সামগ্রিক জঙ্গমশক্তি হরণ করে; যার প্রমাণ স্বাধীনতার ঘোষক সংক্রান্ত বিতর্কে আটকে পড়া মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।

স্বাধীনতার ঘোষণা সংক্রান্ত দুটি প্রধান রাজনৈতিক মহলের যে বিতর্ক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব তা যেন অনেকটা শূন্যমান ক্রীড়ার (Zero Sum Game) মতো। এমন ক্রীড়ায় বিজয়ীর ভাগে সবকিছু প্রাপ্য হয়ে যায় (Winner takes all)। স্বাধীনতার ঘোষক কে? বঙ্গবন্ধু না শহীদ জিয়া? বিতর্ক এটাই। বঙ্গবন্ধুর অনুসারীরা শহীদ জিয়ার কোনো ভূমিকাই স্বীকার করেন না। অন্যদিকে শহীদ জিয়ার অনুসারীরা বঙ্গবন্ধুকে উড়িয়েই দিতে চান। অথচ ইতিহাসের রায় অনুসারে কেউই ইতিহাসের বাইরে নয়; যার যা প্রাপ্য তাই দিতে হবে, কম বা বেশি নয়। স্মর্তব্য, এঁদের জীবদ্দশায় একে অপরকে কেউ অস্বীকার বা হেয় করেননি। বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করার অর্থ আমাদের দীর্ঘ সংগ্রামের চব্বিশ বছরের পটভূমিকে অস্বীকার করা; এবং বলা যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ করেই সামরিক বাহিনীর একজন মেজরের আহ্বানেই শুরু হয়েছিল। এটা তো ইতিহাস হতে পারে না। অন্যদিকে শহীদ জিয়ার ঐতিহাসিক ভূমিকাকে অস্বীকার

ফর্মুলাটি এমন হতে পারে: আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মস্তিষ্ক– বঙ্গবন্ধু, আত্মা–শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও মাওলানা ভাসানী, সংগঠক–তাজউদ্দীন আহমেদ ও জেনারেল এম এ জি ওসমানী, তরবারি– শহীদ জিয়াউর রহমান

ফর্মুলাটিতে যার যে অবস্থান নির্দেশিত হয়েছে তা তার অবদানকে বিবেচনায় রেখেই নির্ধারণ করা হয়েছে। অবস্থান বিবেচনায় কারও অতিমূল্যায়ন ও অবমূল্যায়ন করা হয়নি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মতো জটিল ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া এক ব্যক্তি বা মহল বিশেষের একক অবদানের কারণে সম্ভব হয়েছে এমন কোনো সিদ্ধান্ত অনৈতিহাসিক ও অযৌক্তিক

করার অর্থ মুক্তিযুদ্ধের সূচনা-পর্বের একটি অধ্যায়কে বিলোপ করে ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে নস্যাৎ করা। এটাও ইতিহাস নয়। আবার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দু'জনকে তাঁদের নিজের মাপের চেয়ে বড় করার উদ্যোগ আসলে তাঁদেরকে ছোট করা। এঁরা দু'জনই ছিলেন বড় মাপের মানুষ; তাঁদেরকে অযৌক্তিকভাবে বড় করলে আসলে তাঁরা ছোট হয়ে যান। মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস ও বাংলাদেশের ভবিষ্যতের স্বার্থে এ অনৈতিহাসিক ও অপ্রয়োজনীয় বিতর্কের আশু অবসান কাম্য। কাউকে অস্বীকার বা হেয় না করে যার যা বা যতটুকু প্রাপ্য তা দিয়ে এ বিতর্কের অবসান করা সম্ভব। অবশ্য তার জন্য প্রয়োজন বিতর্কে লিপ্ত মহল দুটোর ইতিহাস-চেতনা ও বাস্তবমুখিন রাজনৈতিক বিবেচনা।

বিতর্কটি নিরসনের জন্য একটি ফর্মুলার মতো প্রস্তাব রাখা যেতে পারে। ফর্মুলাটির উৎস ইটালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। ইটালির সমস্যা ছিল দুটো। প্রথমত, অস্ট্রিয়ার অধীনতা; এবং দ্বিতীয়ত, ভৌগোলিক বিভাজন। সুতরাং ইটালীয়দের লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতার সমান্তরালে একত্রীকরণ। ১৮৭০-এর মধ্যে দুটো লক্ষ্যই অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু তার জন্যে প্রধানত তিনজন মানুষকে বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিতে হয়েছে। এরা ছিলেন ম্যাৎসিনি, ক্যাভুর ও গ্যারিবল্ডি। ম্যাৎসিনি স্বাধীনতার দ্রষ্টা ছিলেন। ক্যাভুর কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতার পথ সুগম করেছিলেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে অস্ট্রিয়াকে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় বিতাড়িত করতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বীর সেনানী গ্যারিবল্ডি। আপাত দৃষ্টিতে ইটালির স্বাধীনতা অর্জনে গ্যারিবল্ডির অবদানই বেশি মনে হয়। কিন্তু গ্যারিবল্ডির সাফল্য ও অর্জনতো ম্যাৎসিনি ও ক্যাভুর-এর অবদানের কারণেই যে সম্ভব হয়েছিল তা ইটালীয়রা কোনো সময়েই বিস্মৃত হয়নি। তারা তিনজনের অবদানকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। ফলে কেউ কারও চেয়ে বড় বা ছোট হয়নি। বা কেউ কারও ভক্তকুলের দ্বারা অতি প্রশংসিত বা অবহেলিত হননি। যার যা প্রাপ্য সম্মান ইটালীয়রা তাকে তাই দিয়েছে। সেজন্যই স্বাধীনতা সংগ্রামের তিন নায়ককে নিয়ে কিংবদন্তি গড়ে উঠেছে এবং কবিতা রচিত হয়েছে এমনভাবে : স্বাধীনতার মস্তিষ্ক ম্যাৎসিনি, আত্মা ক্যাভুর, এবং তরবারি গ্যারাবিল্ডি, (brain, soul and sword)। অর্থাৎ মস্তিষ্ক, আত্মা ও তরবারির সম্মিলিত ভূমিকার ফসল স্বাধীন ইটালি। সুতরাং এ তিনজনের কেউ অবজ্ঞার বা তাদের কোনো অবদান অবহেলার নয়।

আমাদের স্বাধীনতার পটভূমি বিনির্মাণে ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে একাধিক নেতা-ব্যক্তিত্বের অবদান আছে। তাদের কাউকে অস্বীকার করে বা হেয় করে আমাদের স্বাধীনতার যথার্থ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং ইটালির স্বাধীনতা সংগ্রাম সংক্রান্ত জনশ্রুতিকে ফর্মুলার কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করে আমাদের প্রয়োজনকে বিবেচনায় রেখে তা পরিবর্ধিত করা যেতে পারে। ফর্মুলাটি এমন হতে পারে:

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মস্তিষ্ক—বঙ্গবন্ধু

আত্মা—শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও মাওলানা ভাসানী

সংগঠক—তাজউদ্দীন আহমেদ ও জেনারেল এম এ জি ওসমানী

তরবারি— শহীদ জিয়াউর রহমান

ফর্মুলাটিতে যার যে অবস্থান নির্দেশিত হয়েছে তা তার অবদানকে বিবেচনায় রেখেই নির্ধারণ করা হয়েছে। অবস্থান বিবেচনায় কারও অতিমূল্যায়ন ও অবমূল্যায়ন করা হয়নি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মতো জটিল ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া এক ব্যক্তি বা মহল বিশেষের একক অবদানের কারণে সম্ভব হয়েছে এমন কোনো সিদ্ধান্ত অনৈতিহাসিক ও অযৌক্তিক।

বিশৃঙ্খল ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে শহীদ জিয়াউর রহমানের প্রথম ঘোষণা ছিল নিজের নামেই। কিন্তু পরবর্তী ঘোষণা দুটো তিনি বঙ্গবন্ধুর নামেই করেছিলেন। ঘোষণা ভাষ্যে এই পরিবর্তন হয়েছিল প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে। ফলে যা হয়েছিল তা ঘোষণা নয়, বরং ঘোষণার প্রচার। কিন্তু এটা তো অনস্বীকার্য যে, জিয়াউর রহমানের সেই প্রচারিত ঘোষণাগুলো সূচনাপর্বে মুক্তিযুদ্ধকে সুসংহত করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল। স্বতঃস্ফূর্ত ও বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধে লিপ্ত জনগণ ও বাঙালি সৈনিক সেদিন কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে একজন সৈনিকের কণ্ঠে এই প্রচার শুনে আশ্বস্ত হয়েছিল যে, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। উপরন্তু এই প্রচার বাংলাদেশের বাইরেও শ্রুত হয়েছিল। সুতরাং এই বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়ার কণ্ঠে যা প্রচারিত হয়েছিল তার দৈশিক ও বৈশ্বিক তাৎপর্য ছিল। এক ক্রান্তিকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল এই তরুণ বাঙালি সৈনিককে। কাজেই তাঁর ভূমিকা অস্বীকার বা অতিমূল্যায়ন করার কোনো অবকাশই নেই। উপরন্তু ১৯৭২-এ 'একটি জাতির জন্ম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে শহীদ জিয়াউর রহমান নিজেই বঙ্গবন্ধু-নেতৃত্বের অগ্রগণ্যতাকে স্বীকার করেছেন। এরপর তাঁর অনুসারীরা তাঁকে বঙ্গবন্ধুর চেয়ে বড় করতে চাইলে তা কীভাবে গ্রহণযোগ্য হয়? অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর অনুসারীরা এই জিয়াকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে চাইলে তাও বা কীভাবে হয়?

ইতিহাসের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতার ঘোষণা/ঘোষক বিতর্কটিকে বিবেচনা করলে স্মরণ করা উচিত ১৯৫৩তে শেরে বাংলার ঘোষণা Let East Pakistan work out its own destiny; এবং ১৯৫৪তে মাওলানা ভাসানীর পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আস্সালামু আলায়কুম' জানানো। প্রতীকী অর্থে হলেও স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাসে এ উচ্চারণগুলো গুরুত্বসহ বিবেচ্য। উপরন্তু ৭ মার্চের ভাষণে যে দিকনির্দেশনা ছিল তা স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। এই ভাষণের পর অতিরিক্ত ঘোষণার প্রয়োজন ছিল না। ২৫-২৬ মার্চ মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধুর যে ঘোষণা তা-ও তো ছিল অতিরিক্ত। উপরন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ করার সময়ে কোনো বাঙালিই ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করেনি। সেই উত্তাল সময়ে কেউ কোনো ঘোষণা না দিলেও মুক্তিযুদ্ধ ঠিকই শুরু হতো এবং হয়েছিল।